কর্মক্ষেত্র, বিশেষ সংখ্যা, ৬ জানুয়ারি ২০০২

প্রধান সম্পাদকের কথা

জীবনদায়ী গাছ-গাছড়া থেকে জীবিকা

২৪ ডিসেম্বর কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে উদ্যোগ শিবিরের আলোচনাচক্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, ভারত সরকার ২৯টি মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট চিহ্নিত করেছেন। তারমধ্যে ১৯টি আমাদের এই রাজ্যেই পাওয়া যায়।

মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট বা ওষধি লতাগুল্মের কথায় আমার অনেক দিন আগের একটা লেখার কথা মনে পড়ল। প্রায় ২২ বছর আগে 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকার প্রথম পাতায় লিখেছিলাম। সেই লেখায় এরকম দুয়েকটি আশ্চর্য উদ্ভিদের উল্লেখ ছিল। তবে, ওষধি গাছ-গাছড়া দেখে সত্যিকার অবাক হয়েছি বছর দুয়েক আগে, ব্রাজিলের আমাজনের জঙ্গলে। সেই আদিম অরণ্যে কত রকম যে ওষধি গাছ দেখেছি তার বিবরণ দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে।

যাইহোক, জীবনদায়ী ওষধি গাছ যে জীবিকাদায়ীও হয়ে উঠতে পারে, সে-বিষয়ে বাংলার গ্রামবাসী তরুণদের এবার সচেতন হওয়ার সময় হয়েছে। কী দেশে কী বিদেশে সর্বত্রই এখন এইসব বনৌষধির বিপুল চাহিদা। সেকথা মনে করেই আমার সেই পুরনো লেখাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল:

কর্পূরগাছের চাষ করলে কেমন হয়? কিংবা ঘৃতকুমারী? ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির উঠোনে এই গাছ দেখেছি। পাতাটা মাঝখান থেকে ভেঙে ভেতরের শাঁসটুকু মাথার তালুতে রাখলেই মাথার উত্তাপে তক্ষুনি সেটা গলে জল হয়ে গড়িয়ে পড়ত। ক্বাথ জাতীয় একটা জিনিসকে ওভাবে গলে যেতে দেখে আমার খুবই অবাক লাগত। ওটা ছিল আমার প্রিয় একটি খেলা। বড় হয়ে শুনেছি ঘৃতকুমারীর পাতা নাকি মাথা গরমের ভালো ওষুধ।

বিশল্যকরণী মনে আছে? সেই যে রামায়ণে লক্ষ্মণকে বাঁচানো হল যা দিয়ে। ওই গাছ আমি নিজেই আমার পড়ার ঘরের সামনে লাগিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে বেগুনি রঙের গাছ। অনেকটা জায়গা রঙিন হয়ে থাকত। ছেলেবেলায় একবার ট্রেনে ভৃঙ্গরাজ লতার বোঝা নিয়ে যাচ্ছিল একটা লোক। ওই দিয়েই মহাভৃঙ্গরাজ তেল হয় শুনে আমি তো অবাক। আমি যাচ্ছিলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে, লোকটার কাছ থেকে একটা লতা নিয়ে উল্টোদিকের ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে যাই। সন্ধের আগেই লতাটি মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলাম। ওই লতা আপনা থেকেই বাগানময় ছড়িয়ে গিয়েছিল।

এই রকম ওষুধভরা কত যে গাছপালা লতাপাতা আছে এই পৃথিবীতে, তার হিসেব নেই। ওষুধ তৈরিতে, মাথার তেল তৈরিতে এরকম অসংখ্য লতাপাতা শেকড়বাকড় প্রচুর পরিমাণে দরকার হয়। তেল ওষুধ ইত্যাদি প্রস্তুতকারকের কাছে এইসব ওষুধগাছ বা বনৌষধির খুবই চাহিদা। পরিকল্পনা মতো এইসব বনৌষধির চাষ ও ব্যবসা খুবই মনের মতো কাজ হতে পারে। লাভজনক তো বটেই।

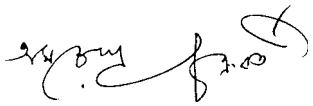

কর্মক্ষেত্র, বিশেষ সংখ্যা, ৩ মার্চ ২০০২

প্রধান সম্পাদকের কথা

এবার বাংলায় স্বনিযুক্তির জোয়ার আসুক

কর্মক্ষেত্র-র চোখে ভালো সরকার মানে— যাঁরা মর্মে মর্মে বোঝেন কর্মপ্রার্থীদের কাজ দরকার। কর্মক্ষেত্র-র মতে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানে যতটুকু কাজের সম্ভাবনা, তাকেই সর্ব শক্তি দিয়ে, সুদৃঢ় সংকল্প দিয়ে বাস্তব করে তোলার চেয়ে বড় কাজ আজ আর কিছু নেই। রাজা আসে, রাজা যায়। কর্মহীন প্রজার চোখের জল চোখেই শুকায়— বছরের পর বছর, দশকের পর দশক এই একই দৃশ্য। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছে কর্মক্ষেত্র-র অনুরোধ, এই দৃশ্য এবার আমূল বদলের কথা ভাবুন। যাঁরা ভাববেন আমরা শুধু তাঁদেরই ভালো সংস্থা, ভালো সরকার ভাববো।

এবারের এই বিশেষ সংখ্যা এই একটি দিক থেকে, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ প্রতিবেদনে, একান্ত সাক্ষাৎকারে, পেশার দিশায় সাজাবার চেষ্টা করেছি কর্মজীবনের নানা দিগন্ত। বাঙালি যুব সম্প্রদায় যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সেজন্য আমরা খুলে দিয়েছি নানা সম্ভাবনার জানালা। আমাদের এই চেষ্টার সার্থকতা কতটুকু তার পরিমাপ হবে পাঠকের কতটা কাজে লাগবে— সেই তুলাদণ্ডে। শুধু নিযুক্তি নয়, এবার বাংলায় স্বনিযুক্তির জোয়ার আসুক। একদিকে নিত্যনতুন পেশা, আর একদিকে স্বাধীন কাজের নেশা— কর্মক্ষেত্র দুই পথেই যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কেননা সামনে আমাদের একটাই লক্ষ্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই যুগের সহস্রমুখ কর্মচাহিদার উপযুক্ত হয়ে ওঠা।

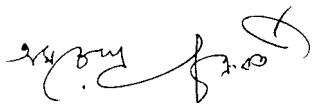

কর্মক্ষেত্র, বিশেষ সংখ্যা, ৭ এপ্রিল ২০০২

প্রধান সম্পাদকের কথা

মাছ ও ফুল

অনেক কাল আগে আমার মনে একটা কাজের কল্পনা জেগেছিল। নতুন কাজের দিশা নিয়ে একটা আলপনা আঁকার চেষ্টা ছিল সেটা। কিংবা হয়তো নতুন নতুন কাজসূত্র নিয়ে রূপকথা।

অনেক তরুণ তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিশারিজ ট্রেনিং বা মাছচাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মহীন বসে থাকতেন। যে দুয়েকজনের পৈতৃক পুকুর আছে তাঁদের বাদ দিলে অধিকাংশ তরুণই সেই প্রশিক্ষণ বাস্তবে প্রয়োগ করার সুযোগ পেতেন না।

তখন বকখালি ফ্রেজারগঞ্জ পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। একই সঙ্গে পর্যটনের বিস্তার আর নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টির কথা ভেবে আমি লিখেছিলাম— ডায়মন্ডহারবার থেকে বকখালি পর্যন্ত রেললাইন পাতা গেলে পর্যটন আর কাজের সুযোগ দুইই বাড়বে। নামখানায় হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর ওপর সেতু বেঁধে প্রায় সমুদ্রতীর অবধি টয়ট্রেন বা ছোট ট্যুরিস্ট ট্রেন চালানো গেলে সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যহীন কলকাতার মানুষ একবার মাত্র ডায়মন্ডহারবারে ট্রেন বদলে সোজা ট্রেনে চড়েই সমুদ্রে পৌঁছে যাবে।

তার চেয়ে বড় কথা, রেললাইন পাততে জমি উঁচু করতে হবে, ফলে মাটির দরকার। আমার প্রস্তাব ছিল, রেললাইনের সমান্তরালে অনেকটা ব্যবধান রেখে খাল কেটে মাটিও পাওয়া যাবে। আর সেই দীর্ঘ খাল দুয়েক কিলোমিটার করে মাছচাষের ট্রেনিং পাওয়া ছেলেদের সস্তায় লিজও দেওয়া যাবে।

প্রশ্ন হল, নদীজলসিক্ত নরম মাটির ডায়মন্ডহারবার থেকে নামখানা পেরিয়ে এভাবে রেললাইন পাতা কি সম্ভব? অথবা এ কি সত্যিই অসম্ভব? আমাদের অনুরোধ, এই স্বপ্ন সত্য হয় কিনা খতিয়ে দেখা হোক।

কথাটা অনেক দিন আগে লিখেছিলাম, এতদিন পরে আবারও লিখলাম। কেননা আমাদের রাজ্যে এখন যেন এক রূপকথার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্নের যেমন শেষ নেই, স্বপ্নকে সত্যি করে তোলার উদ্যমেরও তেমনই সীমা নেই।

ঠিক যে, রেল কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে। সেক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজটির গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করতে পারেন। হয়তো পারেন রাজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রভাবিত করতে।

দেরি হয়ে গেলেও, এখনও সময় আছে।

এতো গেল মাছ নিয়ে। এবার ফুল নিয়ে আরেকটা কাজের কথা।

গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম জাপানে। টোকিওর ১৩০ বছরের প্রাচীন হোসে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেডেশন অনুষ্ঠানে দেখলাম সদ্য স্নাতক প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর হাতে ফুল। এটা জাপানের চিরাচরিত প্রথা। প্রখ্যাত জাপানি হাইকু-কবি, হোসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক গোরো ইহারা আমাকে চমৎকার করে বুঝিয়ে দিলেন, স্নাতকত্ব লাভের এই শুভ অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা চিরাচরিত জাপানি পোশাকে সেজে তাদের অধ্যাপকদের হাতে ফুল তুলে দেয় ও তাঁদের হাত থেকে শংসাপত্র নেয়। তারপর ছাত্র-শিক্ষক সবাই মিলে একসঙ্গে মহানন্দের মধ্যাহ্নভোজ।

কয়েকজন ছাত্রীর হাতে ফুল দেখে মন তো ভরলই, একটা কাজের কল্পনাও মনে হল। আমাদের রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে অনুষ্ঠান-প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে যদি আমরা দুয়েকটি করে ফুল বা পুষ্পস্তবক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি? ছোট বড় মাঝারি স্তবক বা আলাদা একটি দুটি ফুল? যদি সদ্য স্নাতক-স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিই— কম দামে বা মাঝারি দামে? কেউ কি কিনবেন না? সবাই মুখ ফিরিয়ে নেবেন? না কি এভাবেই ক্রমশ আমাদের সমাবর্তন উৎসবে লাগবে রঙের ছোঁয়া, ফুলের সুবাস, শিক্ষক-ছাত্রের পারস্পরিক হৃদয়স্পর্শ? হয়তো এভাবেই কিছু ছেলেমেয়ের জীবনে শুরু হবে কিছু কিনে বিক্রি করার স্বাধীন জীবিকা?

শুধু মাছ চাষ আর ফুল বেচা সকলের জন্য নয়। যাঁরা নানা ধরনের চাকরির জন্য সচেষ্ট, বা আধুনিক যুগোপযোগী নানা পেশার জন্য তৈরি হচ্ছেন, তাঁদের জন্য তো 'কর্মক্ষেত্র'র নানা আয়োজন, তাঁদের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ সাজিয়ে দেওয়া হয় নানা তথ্য, পরামর্শ ও পথনির্দেশের ডালি। কিন্তু যাঁদের প্রস্তুতির পালা শেষ বা অসমাপ্ত, যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির স্বাভাবিক স্রোত নানা সমস্যার মরুপথে হারিয়ে গেছে, আমার এইসব মরিয়া কাজের কল্পনা সেইসব দুঃখী কিন্তু দুঃসাহসী মানুষের জন্য। কে বলতে পারে, কারও কারও জীবনে এইসব সামান্য সূচনাই একদিন বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে না।

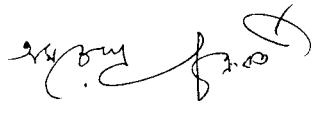

কর্মক্ষেত্র, বিশেষ সংখ্যা, ৫ মে ২০০২

প্রধান সম্পাদকের কথা

শুভ কর্মপথের দিশা

সময় কত দ্রুত বদলায় তা সব সময় আমাদের খেয়াল থাকে না। একশো বছর আগে বাঙালির পরিধান, খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে কি? নেই। আমূল বদলে গেছে। শুধু জীবিকার ক্ষেত্রেই কত না পরিবর্তন! সে-যুগের প্রচলিত অনেক পেশার আজ আর নামই শোনা যায় না। মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও যেসব পেশার প্রচলন ছিল, তার অনেকগুলি এখন উধাও। যেমন ইংরিজি টাইপিস্ট, হিসাবের খাতা লেখক, কাঁসার বাসনের ফেরিওলা, ছাপাখানার কম্পোজিটর, লাইনো-মোনো অপারেটর, ব্লক মেকার— এরকম আরও অনেক।

আবার, এখনকার অনেক উজ্জ্বল পেশার অস্তিত্বই ছিল না সে যুগে। মাত্র কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও কেউ কি কম্পিউটার প্রোগ্রামার কিংবা সফটওয়্যার বা টিভি অ্যাড নির্মাতার কথা জানতেন? কল্পনা করতে পারতেন কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টেন্সি বা মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন বা ওয়েব পেজ ডিজাইনিংয়ের কাজ? এখনকার বহুপরিচিত ডি টি পি অপারেটর পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে কোথাও ছিলেন কি?

সময় বদলায়। পরিবর্তিত যুগের প্রয়োজন বদলায়। প্রযুক্তি বদলায়। প্রযুক্তির বিকাশও ঘটে প্রচণ্ড গতিতে। ফলে জীবিকাজগতেও আসে বিপুল পরিবর্তন। অনেক প্রচলিত পেশা লুপ্ত হয়ে যায়, অনেক নতুন পেশার জন্ম হয়।

নতুন যুগের ছেলেমেয়েদেরও তাই শুধুই অভিভাবকদের অভিজ্ঞতার অনুসরণে পূর্বপুরুষের পুরনো প্রচলিত পেশার পথে না হেঁটে নতুন নতুন পেশার দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত। উচিত যুগোপযোগী পেশার উপযুক্ত হয়ে ওঠা।

সেইজন্যই স্কুলের পড়া শেষ করে প্রথমেই দরকার সঠিক পেশা বেছে নেওয়া। ছাত্রজীবনের একটা খুব বড় প্রয়োজন পেশা নির্বাচন।

ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচনের সময় একদিকে জানতে হয় পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, অন্যদিকে বুঝতে হয় নিজের প্রবণতা ও মানসিক সামর্থ্য। চাকরির বাজারে খুব চাহিদা, আবার নিজেরও ভারি পছন্দ, এমন পেশা বাছতে পারলে ছাত্রজীবনের সব শ্রম সার্থক। এর উল্টোটা হলে পুরো ছাত্রজীবনটাই নিষ্ফল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ছাত্রজীবনের শেষে কর্মজীবন শুরু করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। খুব দুঃখের সঙ্গেই বলছি, এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যা হোক কিছু একটা পড়ে তাঁদের মহা মূল্যবান ছাত্রজীবনের বীজগর্ভ বজ্রগর্ভ বছরগুলি বৃথাই কাটিয়ে দেন। বিফলে যায় তাঁদের আত্মপ্রস্তুতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, নিষ্ফল হয়ে যায় নিজেকে গড়ে তোলার সেরা মরসুম।

অনেকেই দেখেছি মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের পর সামনে যা পান, বা শেষ পর্যন্ত যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই অর্থহীন অধ্যয়নে দিন কাটান। ফলে কয়েক বছর পর থেকেই দীর্ঘকাল তাঁদের কর্মহীন যৌবনের বেদনা বয়ে বেড়াতে হয়। অনেক অভিভাবকের মনেই বদ্ধমূল ধারণা— স্নাতক বা স্নাতকোত্তর হওয়াটাই সর্বজনগ্রাহ্য সামাজিক সম্মানের। অতএব কোনওক্রমে বারোর গণ্ডি পেরিয়েই নির্বিচারে বি এ, বি এসসি, বি কম পড়ার ধুম পড়ে যায়। তারপর এম এ, এম এসসি, এম কম। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাও ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবার বাঁধা রাস্তার বাইরে বড় একটা যেতে চান না। এই পড়া অর্থহীন, এই পাঠ অর্থ ও সময়ের অপচয়।

গত বাইশ বছর ধরে 'কর্মক্ষেত্র' অসংখ্য পেশার ও পড়াশোনার হদিশ দিয়ে আসছে। প্রচলিত, অপ্রচলিত, পরিবর্তিত, সদ্য-প্রবর্তিত, অভিনব, আকর্ষক— নানা ধরনের পাঠক্রমের সুলুকসন্ধান দিচ্ছে। নতুন যুগের প্রয়োজনে এর ওপর শুরু হয়েছে নতুন বিভাগ 'পেশার দিশা'। কিন্তু কোনও সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে দ্রুত পরিবর্তনশীল এই যুগের নিত্যনতুন পেশামালার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা কি সম্ভব? সপ্তাহে সপ্তাহে, খণ্ড খণ্ড ভাবে? সম্ভব নয়। সেইজন্যই 'কর্মক্ষেত্র' এবার ছাপার অক্ষরের বাইরে এসে আয়োজন করছে 'পেশা মেলা'র। উদ্দেশ্য, পাঠকের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নতুন যুগের পেশাসমগ্র মেলে ধরা। এক সঙ্গে, এক ছাদের নিচে নানা পেশার মেলা, বিভিন্ন পাঠক্রমের প্রদর্শনী। এই মেলা যুবসমাজকে দেবে যুগোপযোগী পেশার দিশা।

যাঁরা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, বা যাঁরা এবছরই এই দুটি পরীক্ষা দিয়েছেন, মেলায় তাঁদের জন্য যেমন নানান নামী দামি প্রশিক্ষণ বা পাঠক্রমের তথ্য-পরামর্শ মিলবে, তেমনই যাঁরা স্কুলের পর পড়াশোনার আর সুযোগ পাননি বা যাঁরা স্কুলের গণ্ডিও পেরতে পারেননি তাঁদের জন্যও থাকছে নানান কাজ ও প্রশিক্ষণের পথপ্রদর্শন। যাঁরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে কিছু করতে চান, গড়তে চান নিজস্ব কোনও ছোটখাটো ব্যবসা, তাঁরা পাবেন একসঙ্গে একনজরে অনেকরকম ব্যবসার রূপরেখা।

সকলের জন্যই মিলবে কোনও না কোনও পথ। নানা পেশার নানা পথের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠবে এই পেশা মেলা— 'কর্মক্ষেত্র' কেরিয়ার অ্যান্ড কাউন্সেলিং ফেয়ার ২০০২। আমাদের আশা, এ মেলা সর্বজনের কর্মজীবনের প্রবেশপথে আলো দেখাবে, তরুণ সমাজকে এগিয়ে দেবে শুভ কর্মপথে।

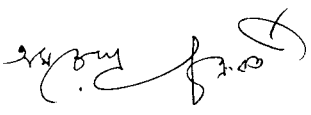

কর্মক্ষেত্র, ২৬ মে ২০০২

প্রধান সম্পাদকের কথা

জন্মমাসে নবজন্ম

আজ থেকে তেইশ বছর আগে 'যুগান্তর'-এ শুরু হয়েছিল 'কাজের কথা'। কর্মপ্রার্থী, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চাকরি, প্রশিক্ষণ, পড়াশোনা ও স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের নিত্যনতুন সুলুকসন্ধান নিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সাংবাদিকতার সেদিন সূচনা হল। 'কাজের কথা'র প্রাথমিক পরিকল্পনার সময় সপ্তাহে একদিন লেখার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু যুগান্তর-এর তখনকার যুগ্ম-সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরীর আদেশে সপ্তাহের ছ-দিনই লিখতে হত। লিখতাম 'কর্মদূত' ছদ্মনামে।

এক চিলতে ওই লেখা তরুণসমাজে কীরকম সাড়া জাগিয়েছিল সে ইতিহাস হয়তো এখনও অনেকের মনে আছে। সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান থেকে প্রতিদিন তিন-চার হাজার পাঠকের চিঠি আসত। 'কাজের কথা'র প্রেরণা বা পথনির্দেশে কাজ পেয়ে আনন্দ বা ধন্যবাদ জানাতেও চিঠি লিখতেন বহু পাঠক। 'কর্মদূত, যুগান্তর, কলকাতা' বা খামের ওপরে শুধুই 'কর্মদূত' লেখা চিঠিও ডাককর্মীরা কীভাবে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিতেন ভেবে অবাক হতাম।

সেই কর্মদূতের এককলম 'কাজের কথা'য় লক্ষ পাঠকের প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ায়, ১৯৮০ সালের ৪ জুলাই প্রকাশিত হল কর্মদূত সম্পাদিত আরও বেশি কাজের কথার একটি সংকলন— 'কর্মক্ষেত্র'। ২৫ জুলাই থেকে এই সংকলনই হয়ে উঠল হাজারদুয়ারী জীবিকাজগতের পথ-দেখানো, নিত্যনতুন কাজের কথায় ভরপুর, তরুণসমাজের হৃদয়-ছোঁয়া এক অভিনব, অভূতপূর্ব সাপ্তাহিক পত্রিকা।

কর্মসাংবাদিকতার পথপ্রদর্শক, আদি ও অগ্রণী 'কর্মক্ষেত্র' নিজের ২১ বছরের ইতিহাস অতিক্রম করে, বহুমুখে বিকশিত হয়ে, বহুদূর প্রসারিত হয়ে এখন আরও নতুন ও যুগোপযোগী বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

গত মাসে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'কর্মক্ষেত্র' আয়োজিত পেশা-মেলা সেই নতুন পথে এগিয়ে যাওয়ারই একটি ধাপ। এগিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ পাঠককে আরও এগিয়ে দেওয়া।

এই সংখ্যার কোনও কোনও সংবাদও আমাদের সংবাদ-পরিবেশনের নতুন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া।

'পেশার দিশা'য় পাঠকের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ— সেও নতুন পথে এগিয়ে যাওয়া।

এরকম আরও অনেক। এ সবই সামান্য সূচনা।

জুলাই মাসে 'কর্মক্ষেত্র'র জন্ম। সামনেই সেই জুলাই মাস। তার শুরু থেকেই 'কর্মক্ষেত্র' এভাবে কেবলই নতুন নতুন পথে এগিয়ে যাবে। পাঠককে এগিয়ে দেবে তার জীবিকার দিকে, জাগিয়ে দেবে তার জীবনের মন্ত্রে।

এবছরের জন্মমাস 'কর্মক্ষেত্র'-র নবজন্মেরও মাস।

'নতুন শতাব্দীর নতুন কর্মক্ষেত্র' কোনও কথার কথা নয়।

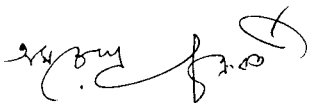

কর্মক্ষেত্র, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮০

কর্মদূতের কলম

আমার মনে একটা অদ্ভুত কল্পনা আসছে। এমন কখনো হতে পারে না যে দেশময় চাকরির ছড়াছড়ি কিন্তু প্রার্থী খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। নিয়োগকর্তারা একেকটা শূন্য পদের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে খবরের কাগজে রেডিওয় টেলিভিশনে শুধু বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন, মেয়ের বাবা যেভাবে পাত্র খোঁজেন, ঠিক সেইভাবে নিয়োগকর্তা খুঁজছেন কর্মচারী— কিন্তু কাউকেই নানারকম পণ-টনের টোপ ফেলেও চট করে চাকরিতে রাজি করাতে পারছেন না! যাঁরা রাজি হচ্ছেন তাঁদের নানান বায়নাক্কা, অনেক খাঁই। গাড়ি চাই, বাড়ি চাই, শরতে বসন্তে কোম্পানির খরচে বিদেশ বেড়াতে চাই— এরকম হাজারো শর্তে হাজারে দু-একজন মাত্র যুবক চাকরি নিতে রাজি হচ্ছেন। তার কারণ আর কিছুই না, যুগান্তরে আর কর্মক্ষেত্রয় কর্মদূতের লেখা পড়ে ইতিমধ্যেই দেশের যুবসম্প্রদায় স্বাধীন কাজ শুরু করে দিয়েছেন। স্বাধীন কাজে আনন্দ, আত্মসম্মান, আত্মবিকাশের সুযোগ যে অনেক গুণ বেশি সেকথা সবাই বেশ তখন জেনে গেছেন। কে আর তখন অন্যের চাকরি করার কথা ভাবতে যাবে!

উঃ, ভাবলেও বুক শিরশির করে।

আচ্ছা, এতটা না হোক, এর কিছুটাও কি সত্যি হতে পারে না? ঠিক যে, সব যুগেই এরকম কিছু লোক থাকেন যাঁরা চাকরি ছাড়া কিছু ভাবতেই পারেন না। সেরকম কিছু লোক তো দরকারও। আমি তাঁদের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি দেশের সেইসব লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর কথা, যুব সম্প্রদায়ের কথা, যাঁরা বছরের পর বছর সামান্য একটা চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন, ঘুরে ঘুরে কোথাও কোনো চাকরি না পেয়ে চির হতাশায় ডুবে যাচ্ছেন। আপনারা কি এভাবে হতাশ না হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারেন না? মুখ থেকে কর্মহীনতার দুশ্চিন্তা, অবসাদ, ক্লান্তি মুছে ফেলে, হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে, খুব সুন্দর একটা সুরে শিস দিয়ে উঠে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন না? যে কাজ কারো কাছে চাইতে হয় না, ভিক্ষে করতে হয় না, যে কাজ নিজের দুহাতে, নিজের মেধায় নিজস্ব প্রতিভায় করা যায়! যত শ্রমের কাজই হোক, আপনি যদি সেই শ্রমকে জয় করতে পারেন, ভয় কী?

আপনি কী চান? দিনের পর দিন কাচুমাচু মুখে আর একটা চাকরি চেয়ে বেড়ানো, না এক্ষুনি শ্রমে-ভরা স্বাধীন কর্মময় জীবন? যদি স্থির জানেন, দ্বিতীয়টাই আপনি চান তাহলে আমাকে চিঠি লিখতে পারেন।

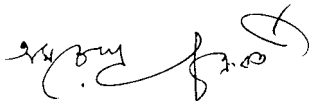

কর্মক্ষেত্র, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮০

কর্মদূতের কলম

ছেলেবেলায় তো আর বেকার ছিলেন না। তখন তো খেলাধুলো, হৈ-হুল্লোড়, মাঠে-ঘাটে আকাশে-বাতাসে ছুটোছুটি— এইসব নিয়েই কাটতো, তাই না? আর গল্পের বই পড়া।

এখন না-হয় সে-ইচ্ছে সেই মন আর নেই, হয়তো সেরকম সুযোগও নেই। কিন্তু তখন, সেই স্বর্গ-ছোঁয়া ছেলেবেলায় রূপকথার বই তো নিশ্চয়ই পড়েছেন? রূপকথায় ব্যাঙবেশী বানরবেশী রাজকুমারদের কথা মনে পড়ে? রূপে-গুণে দেবতুল্য সেইসব রাজকুমার ব্যাঙের চেহারায়, বানরের চেহারায় আত্মগোপন করে বছরের পর বছর দারুণ দুঃখময় দুর্দশাময় জীবন কাটাতো। তারপর একদিন কেউ তার ক্ষণিক খুলে রাখা খোলস তুলে নিয়ে পুড়িয়ে দিলেই জগতের কাছে ঝলমল করে উঠতো মহাগুণী মহাপ্রতিভাবান এক সত্যিকার রাজপুত্র।

আমর কী রকম মনে হয়, বছরের পর বছর যাঁরা বেকার বসে বসে দিন কাটাচ্ছেন তাঁদের অনেকেই আসলে রূপকথার সেই ব্যাঙ-রাজপুত্র, বানর-রাজপুত্র। কর্মহীন, আশাহীন, আত্মপ্রকাশহীন জীবনের গ্লানিকে তাঁরা খোলসের মতন গায়ে জড়িয়ে রেখেছেন। এটা যে একটা খোলস, গায়ের চামড়া নয়, সে কথাটাও অনেকে ভুলে গেছেন। এর থেকে বেরিয়ে আসা যায়, টান মেরে খুলে ফেলা যায় এই কর্মহীনতার খোলস— এ কথাটা অনেকের একবার মনেও পড়ে না।

যাঁরা শুধু অন্যের দয়ার দিকে চোখ রেখে দিন গুনছেন— কবে কোন্ একটা অফিসের চিঠি এসে তাঁকে চাকরিতে ডেকে নিয়ে যাবে, তাঁরা কিন্তু নিজের মুখের দিকে একবার ভুলেও তাকাচ্ছেন না। নিজের ঐশ্বর্য নিজেই দেখতে পাচ্ছেন না। তার কারণ, তাঁরা কর্মহীনতার খোলস দিয়ে নিজেকে আপাদমস্তক ঢেকে রেখেছেন। একবার ওই খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসুন, নিজের হাতে, নিজের ক্ষমতায়, নিজের মেধায়, নিজের মেরুদণ্ডের জোরে শুরু করুন কোনো স্বাধীন কাজ, ছোটখাটো কোনো ব্যবসা, দেখবেন ওই কাজের সংঘর্ষেই জ্বলে উঠবে আপনার ব্যক্তিত্ব। ওই কাজ থেকেই ঝলমল করে উঠবে আপনার ভেতরকার আসল রাজপুত্র। সে কাজ যদি গুল তৈরি কিংবা ঘুঁটে বিক্রির কাজও হয়, শাড়ি অথবা সোয়েটার কি খবরের কাগজ ফেরি করাও হয়, তাতে কিছুই যায় আসে না। এই পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোট নয়, যদি তা অসৎ না হয়।

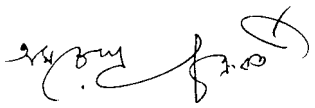

কর্মক্ষেত্র, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮০

কর্মদূতের কলম

আমাদের এই যুগ কিসের যুগ? বেকারির? বিকারের? বিভেদের? ব্যাভিচারের? এই যুগ কি লোভের যুগ? ক্ষোভের যুগ? অন্ধকার আর অপমানের যুগ? হত্যা আর হতাশার? কী নামে ডাকব এই যুগকে? কী এর পরিচয়? এ কি তবে দুর্ভিক্ষের যুগ? দুরাত্মার যুগ? দারিদ্রের যুগ? দহনের যুগ? এ কি ভয়ের যুগ? ভ্রষ্টতার যুগ? ক্ষয় আর খরার যুগ?

দেশের চারদিকে চোখ রাখলে, কালের কোলাহলে কান পাতলে এই সবই সত্যি মনে হয়। এইরকমই সব চোখে পড়ে, এইরকমই কানে আসে। ভেবে দেখলে, আলাদা আলাদা ভাবে এর প্রত্যেকটি পরিচয়ই সত্যি।

কিন্তু সব সত্যি সকলেই মানবেন— মানুষের সংস্কৃতির সেটা নিয়ম নয়। অনেকের মতো আমিও আমাদের যুগের এইসব পরিচয় জানি, কিন্তু মানি না। মানতে মন চায় না। আমার খুব ইচ্ছে করে যুগের এই সব পরিচয় মুছে দিই। আমাদের এই যুগকে নতুন মান দিই, নতুন নাম দিই। খুব ইচ্ছে করে আমাদের এই যুগের নতুন পরিচয় দেখব মুগ্ধ হয়ে।

কী পরিচয়? কী মান? কী নাম?

কর্মময়তায়ই হোক এই যুগের প্রধান পরিচয়। এই যুগ হোক কর্মের যুগ। কর্মযজ্ঞের যুগ। কর্মজোয়ারের যুগ। কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মবিকাশের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যুগ। আমাদের এই যুগের নাম হোক কর্মযুগ।

আমি জানি, অনেকে ভাবছেন, এ তো আবেগের কথা! আবেগই তো। মানুষ যে এভারেস্টেও পা রাখতে পারে সে তো সর্বোচ্চকে ছোঁবার আবেগেই। শিশু যে হামাগুড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, টলমল করে হেঁটে বেড়ায়, সে তো উঠে দাঁড়াবারই আবেগে, সঞ্চরণেরই তাড়নায়। পাখির ডানা গজায় কিসের আবেগে? ওড়বার না?

আমার এই আবেগ আমি আগলে রাখতে চাই। এই আবেগ থেকেই আমি হয়তো কিছু করব। হয়তো কিছু গড়ব। তারই ঝাপসা একটা কল্পনা মনে আসছে। এখন সময় নেই, যদি কখনো ক-দিনের ছুটি পাই, যদি কলকাতা ছেড়ে, কাজ ছেড়ে, কলম ছেড়ে পালাতে পারি কোনো দূর সমুদ্রের তীরে কিংবা কোনো দূরের পাহাড়ে তাহলে এই কল্পনার পুরো রূপটি হয়তো ধরতে পারব। ভাবতে পারব, এই কল্পনা থেকে কোনো পরিকল্পনায় সত্যিই আমি যেতে পারি কি-না। পারি কি-না, কয়েক হাজার তরুণ-তরুণীকে আমার স্বপ্নের এই কর্মযুগের সত্যিকার বাসিন্দা বানাতে।

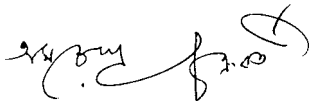

কর্মক্ষেত্র, বিশেষ সংখ্যা, ২-৮ অক্টোবর ২০০১

প্রধান সম্পাদকের কথা

হাতে কাজ, মুখে হাসি

আমি অবাক হয়ে ভাবি, মানুষের কাজ করার ইচ্ছে আছে, ক্ষমতা আছে, শরীরে-মনে আছে অসম্ভবকে সম্ভব করার তারুণ্য, তবু মানুষ কাজ পাবে না? এই পৃথিবীর আলোয়-হাওয়ায়, এই পৃথিবীর কর্মযজ্ঞে সকলেরই তো নিমন্ত্রণ থাকার কথা? তাহলে? দোয়াত আছে কালি নেই, এই অবস্থায় কোনও মহৎ লেখকও যেমন এক অক্ষরও লিখতে পারেন না, তেমনই কর্মী আছে কাজ নেই, এই অবস্থায় কোনও দেশও কিন্তু এক পাও এগোতে পারে না। কর্মহীনতা মানেই জাতীয় সংকট। মানুষের সংসারে, সমাজে, সংস্কৃতিতে এর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

যেমন ঋতুর পর ঋতু আসে, ভোরের পর দুপুর, অক্ষরের পর শব্দ, শব্দের পর বাক্য, ঠিক তেমনই তো ছাত্রজীবনের পর কর্মজীবন আসা উচিত। প্রস্তুতির পর প্রকাশ। ছাত্রজীবনে আমাদের আত্ম-প্রস্তুতি, কর্মজীবনে আত্মপ্রকাশ।

ছাত্রজীবন শেষ করেও যাঁরা কর্মজীবন শুরু করতে পারেন না, তাঁদের যেমন বুকভরা গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ, তেমনই যাঁরা এখনও ওই দুঃখজ্বালার সীমানা থেকে দূরে, এখনও ছাত্র, তাঁদেরও এক ধরনের চিনচিনে নৈরাশ্য থাকে। লেখাপড়া শেষ করে কাজ পাবার অনিশ্চয়তা তাঁদেরও পীড়িত করে।

কে কবে কাজ দেবে সেই দয়ার অপেক্ষায় দিন না কাটিয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান। হাত পাতুন নিজেরই কাছে। তাতে শুধু পাওয়াই হবে না, দেওয়াও হবে। আপনিই কাজ পাবেন, আপনাকে কাজ দেবেনও আপনিই। তার আনন্দ তার মর্যাদা তার গৌরব আলাদা।

একবার নিজের মুখের দিকে তাকান। একবার নিজের ভেতরের দিকে হাতড়ান। দেখবেন সেখানে অনেক ক্ষমতা অনেক সামর্থ্য লুকিয়ে আছে। চোখ মেলে দেখতে চাননি বলেই তারা দেখা দেয়নি।

যে-কাজের জন্যই আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন না কেন— তা সে ছোট বড় মাঝারি চাকরিই হোক কি স্বাধীন কোনও শিল্পোদ্যোগ বা সাদামাটা হাতের কাজই হোক— নিজের ভেতর খুঁড়ে সবটুকু সামর্থ্য তুলে আনুন। তাকে কাজে লাগান। মনের মতো কাজের অপেক্ষায় বসে না থেকে যে কাজ পাচ্ছেন তাকেই মনের মতো করে তুলুন।

নির্ভরতার মতো স্বনির্ভরতাও কি সমান আনন্দের নয়? সুনিশ্চিত পরনির্ভরতার তুলনায় অনেক সময় অনিশ্চিত স্বনির্ভরতাও অনেক বেশি আনন্দের হয়ে উঠতে পারে।

আসুন, নিজেরাই কিছু করি। যেমন বন্ধুরা মিলে মহানন্দে পুকুরে নদীতে চান করতে যায়, কালবৈশাখীর ঝড়ে দল বেঁধে যায় আম কুড়োতে, আসুন না, আমরাও তেমনই অনেকে মিলে কিছু করি। তেমনই আনন্দে, তেমনই মত্ত হয়ে।

অনেকে মিলে মাথা ঘামিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে, মনের আনন্দে অনেক কিছুই করা যায়। এ আজ আর কোনও কথার কথা নয়, নয় নিছক কল্পনা, ঠিক এরকমটাই এখন ঘটছে। কাছে দূরে গ্রামে শহরে এরকম অনেক দৃষ্টান্তই আজ দেখা যায়। এটাই আজকালকার ট্রেন্ড বা প্রবণতা। চমৎকার ঘরে পরার চটি, পুতুল, পেঁচা, দেওয়ালশোভা ইত্যাদি পাট দিয়ে তৈরি করে ব্যবসা করার কথা কেউ কি আগে কখনও ভাবতে পেরেছেন? বেহালার একটি বাঙালি মেয়ে (এই মুহূর্তে তাঁর নাম মনে পড়ছে না বলে লজ্জিত) মনের আনন্দে এই কাজ করছেন। পাটের তৈরি জিনিসগুলো এতই সুন্দর, আর পুরো ব্যবসাটা এতই সফল যে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি নিজে তো স্বনির্ভর হয়েইছেন, তাঁর সংস্থায় আরও কয়েকজন যুবক-যুবতীর কাজের ব্যবস্থাও করেছেন। শুধু দেশের বাজারে নয়, তিনি ভারতের বাইরেও তাঁদের তৈরি পাটের এইসব আশ্চর্য সুন্দর সামগ্রী রপ্তানি করছেন। এই স্বনির্ভরতা কি পরনির্ভরতার চেয়ে অনেক বড় নয়?